The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসে ইতিহাসের আলোকে সুবর্ণরেখা নদীতীরে আদিবাসী জীবন - সংস্কৃতির সুবর্ণময় দলিল

Samiran Sardar
Assistant Teacher. Bachhurkhoard Sc. High School H.S Nayagram, Jhargram, West Bengal, India.
Email Id –samiran.beng@gmail.com DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400075

সারসংক্ষেপ

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে জঙ্গলাকীর্ণ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ স্থানে শান্তির নীড় স্থাপন করে প্রাচীন কাল থেকে বসবাস করছে; প্রাচীন অস্ট্রালয়েড জনগোষ্ঠীর মানুষেরা, সুবর্ণরেখা নদীকে কেন্দ্র করে। নদীতীরে বনপ্রকৃতির ছায়ায় আপন সভ্যতা সংস্কৃতিকে লালন পালনের দ্বারা জীবনকে বৈচিত্র্যময় রঙিন করে তোলে। কথা সাহিত্যিক নলিনী বেরা বাংলা কথাসাহিত্যে অন্ত্যজ অনার্য ভারতীয় মূলবাসীদের নিয়ে গড়ে তোলেন বিচিত্র জীবনকথা। 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসটি সেই নদী-মাঠ-অরণ্যকেন্দ্রিক অন্ত্যজ-অনার্য-প্রান্তিক মানুষদের সুদীর্ঘ প্রাচীন জীবনচর্যার সুবর্ণময় জীবন আলেখ্য। উপন্যাসটিতে অরণ্য প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সুবর্ণরেখা নদীর দুই তীরে অবস্থিত সাঁওতাল, ভূমিজ, লোধা, শবর, ভুঁইয়া, বাউড়ি, টুডু, হেমব্রম, মুর্মু, মাহাতো, হাঁসদা, সোরেন, সিং, মুণ্ডা, মাঝি, পানি, বেহারা, কামার-কুমোর প্রভৃতি সম্প্রদায়দের প্রাত্যহিক জীবন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, জীবনচর্যা, জীবনের আদি পর্ব থেকে বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের আলোকে জীবনের সুখ-দুঃখ, সংগ্রামের ইতিবৃত্ত রচিত। সুবর্ণরেখা নদী, অরণ্য, মাটিকে ভালোবেসে প্রকৃতির তালে তালে মানুষজন প্রকৃতির মতোই সরল-স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে। উপন্যাসের নায়ক আদিবাসী শুদ্র ললিন এর জন্ম নদীর তীরবর্তী গ্রামে। তাই নদীকে ভালোবেসে হংসী নাউড়ীয়ার সঙ্গে নৌকাবিলাসের সময় ললিন এর চোখে নদীর দুধারে জনপদ, বিভিন্ন নদীচর, স্থান এর সৃষ্টির কথা; বোকা নির্লোভ মানুষজনের প্রকৃতির কোলে চাষাবাদ, শিকার, অনাড়ম্বর সহজ সরল জীবনে আপন সাহিত্য - সংস্কৃতিচর্চা, রীতিনীতি, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য প্রভৃতি উপলব্ধি হয়। নির্লোভ মানুষদের সরলতার সুযোগ নিয়ে সভ্য, সাম্রাজ্যবাদী লোভী বর্বর মানুষের দল - বর্গীরা হানা দেয়; ইংরেজদের হাতে অত্যাচারিত হয়, হিন্দু সংস্কৃতি তাদের গ্রাস করতে চায়। এই সব প্রতিকূলতার মধ্যদিয়েও তারা মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও আপন জীবন চর্চায় নিজেদের রঙিন করে রেখেছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য উপন্যাসটিতে ইতিহাসের আলোকে সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী আদিবাসী মানুষদের জীবন - সংস্কৃতির সুবর্ণময় দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

Key words: *Subarnarekha-river-Source, historical consciousness, tribal life, tribal culture, gold, golden document.*

ভূমিকা

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসটি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। যেখানে টাঁড় জঙ্গলের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত সুবর্ণরেখা নদী ও প্রাচীন অস্ট্রালয়েড মানুষদের আপন সাহিত্য-সংস্কৃতি-জীবনচর্যার সুবর্ণময় শিল্পরূপ ফুটে

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

উঠেছে। উপন্যাসে সাঁওতাল-ভূমিজ-মাহাতো-মুণ্ডাদের বন-নদী-মাটি কেন্দ্রিক জীবনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে ললিনের নৌকাবিলাসের মধ্য দিয়ে। অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত ললিন স্কুলের ইতিহাস-ভূগোল বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নৌকাবিলাসের মধ্য দিয়ে নদীর চড়াই-উৎরাই, চর পেরোতো গিয়ে নদীর দুধারে গ্রামের মানুষজন, স্থানের প্রাচীন ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতি নব সূর্যালোকে বালুরাশির স্বর্ণকনায় মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। এই গবেষণার মাধ্যমে সুবর্ণরেখার তীরবর্তী সমগ্র জঙ্গলমহলে আদিবাসী মানুষের জীবন-ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সুবর্ণময় দিকগুলো তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য।

Discussion:

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল 'জঙ্গলমহল'। তার মধ্য দিয়ে চড়াই-উৎরাই হয়ে প্রবাহিত সুবর্ণরেখা নদী। রুখা মাটি টাঁড়-জঙ্গলে আদিবাসীরা শান্তির নীড় স্থাপন করে আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রতিপালন করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে বক্তব্যটি যথার্থ— **"একমাত্র ঝাড়গ্রাম মহকুমার মধ্যেই আঞ্চলিক সংস্কৃতি এক বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে, কারণ ইহার পশ্চিমসীমান্ত ব্যাপীয়া আদিবাসী সমাজের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে উড়িষ্যা সংস্কৃতির সংমিশ্রণ অনুভব করা যায়। এবং উত্তর পশ্চিম অংশে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ইহার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। নানাদিক হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই অঞ্চলের সংস্কৃতি জীবন একটি বিশেষ রূপ লাভ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছে। কারণ এই অঞ্চল অরণ্যাকীর্ণ বলিয়া বহির্জগতের প্রভাব হইতে অনেকখানি মুক্ত থাকিবার সুযোগ পাইয়াছে।"১**

শাবলটান লেখক নলিনী বেরার উপন্যাসে আদিবাসী মানুষজন, তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবনের সুখ-দুঃখ বিশেষ মহিমায় চিত্রিত। তাঁর 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসে জঙ্গলমহলের সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের সামাজিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক জীবনের পাশাপাশি জীবন সংগ্রামের বিচিত্র ইতিহাস সুবর্ণময় দলিলে চিত্রিত করে জীবনের জয় ঘোষনা করলেন। এক অনাড়ম্বর, নির্লোভ, অকৃত্রিম, দারিদ্র্যময় সুখী জীবনচর্যা পরিবেশিত হয়। উপন্যাসের পটভূমি সম্পর্কে লেখকের অভিভাষণ থেকেই জানতে পারি—

"সেই কবে শুরু করেছিলাম! সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী ওড়িশা সংলগ্ন লোধা-ভুঁইঞা-ভূমিজ-কাম্হার-কুম্হার-সাঁওতাল অধ্যুষিত একটা গ্রাম থেকে! বেশির ভাগ সময়টাই যে তল্লাট উৎকলের অধীন ছিল। ভাষাটাও বাংলা নয়। হাফ-ওড়িয়া, হাফ-বাংলা... মূলত রাজু তেলি, সদ্গোপ, করণ, কৈবর্ত খণ্ডায়েৎ—সব 'হাটুয়া' লোকেদের ভাষা। 'হাটুয়া' বা 'কেরা বাংলা'। মান্য বাংলাটাই এখানে 'দিকু' বা বিদেশিদের ভাষা!"২

উপন্যাসের সমগ্র পটভূমিতে আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধি ললিন শুদ্র হলেও সে রোহিনী চৌধুরাণী রুক্মিণী দেবী হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। নদীর তীরবর্তী গ্রামে জন্ম হওয়ায় নদীর প্রতি অমোঘ আকর্ষণে স্কুলের ছুটিতে হংসী নাউড়ীয়ার সঙ্গে নৌকাবিলাসে যায়। নদীর দু'পাড়ে উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত জনপদ, পরিবার, খেত-খামার, নদীচর দর্শনে ও পাঠ্যলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা ললিনের চোখে আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি, স্থানমাহত্ম, ঐতিহাসিক পেক্ষাপট, সুবর্ণময় প্রকৃতি রচিত হয় উপন্যাসের পরতে পরতে।

উপন্যাসের নায়ক কিশোর ললিন আত্মজৈবনিক ভাবনাতে মনে মনে কত কী হতে চেয়েছে— মেজোকার মতো 'কোবরেজে', নাটুয়াদলের নবীনের মতো 'নাচুয়া', হা-ঘরে বাজিকরের দলে ভিড়ে 'বাজিকর', আমেরিকো ভেসপুচ্চী; ভাস্কোদাগামা, গালিভার, কলম্বাসের মতো বিচিত্র দেশ আবিষ্কারক। শেষপর্যন্ত হংসী নাউড়ীয়ার মতো 'মাছধরা'। হংসী নাউড়ীয়ার শিশুমনকে কেন্দ্র করে

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ললিন পাড়ি জমায় সুবর্ণরেখার উৎসপথের দিকে। অস্ত গামী সূর্যটা এক এক সময় কদমডাঙা, ডাঙাসাহি বা কুসুমতলার মাঠে ডুব দেয়। গবাদি পশুর পায়ে পায়ে রাঙা রোদ এসে থামে গোয়ালঘরে। রাত্রি নামে গ্রামের বঁধুদের ভাদুতলায় প্রদীপ দেখানোতে।

নদীর দুপাড়ের মানুষজন সুবর্ণরেখার ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ভয় পায় বন্যার সময়। তখন তারা নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। আবার শরৎ-হেমন্ত ঋতুতে নদীর স্বচ্ছ জলে প্রকৃতির রঙে জীবনকে রাঙিয়ে নেয়। কখনো সকালবেলা নদীর ধারে পূবমুখো হয়ে দাঁড়ালে মনে হবে—

"বাছুরের মতোই লাফিয়ে জল থেকে ছলকে উঠল সূর্যটা। প্রতিদিনই ওঠে, ওঠার পর থেকেই শুরু হয়ে যায় নদীজলে রংয়ের খেলা।..... সূর্যটাই আপন খেয়ালে জলে রং গুলে চলে, আর সেই রং মেখে ছোটোছোটো ঢেউগুলি ছল্‌ছল্‌ করে নাচে।"৩

নদীর জলে নৌকা বাইতে বাইতে ললিন পেরিয়ে যায় বাছুর খোয়াড়, দেউলবাড়, পাতিনা, তালডাঙ্গরা, ছাতিনা, গোপীবল্লভপুর, মশানির দহ অর্থাৎ নদীর উৎসমুখে। সুবর্ণরেখা নদী সৃষ্টি হয়েছে ভারতের প্রাচীন মালভূমি ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে, চারশো কোটি বছর পূর্বে। ৪০-৯০ কোটি বছর আগে 'তুষারযুগ' পেরিয়ে মৌসুমী বায়ু প্রবাহের দ্বারা প্রবল বৃষ্টিপাতে নদী সৃষ্টি হয়।

"তৈরি হয়ে গেল দামোদর, উত্তর কোয়েল – দক্ষিণ কোয়েল, সুবর্ণরেখা। হুড্রু ফলস—মালভূমির আটশ মিটার উঁচু থেকে নামছে সুবর্ণরেখার জল।"৪

সুবর্ণরেখা নদী ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলার নগরী গ্রামের 'Surface spring' থেকে উৎপন্ন হয়ে পুরুলিয়ার পশ্চিম প্রান্তকে কুনুইয়ের ভাঁজ রেখে ঝাড়খণ্ডের চাণ্ডিল, সরাইকেল্লা, ঘাটশিলা, বহড়াগোড়া হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর হয়ে দক্ষিণে বাঁক নিয়ে ওড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার ওলমারা থানার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তালসারির কীর্তনিয়া বন্দরের কাছে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এই নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৯৫ কিমি। নদীর উচ্চগতি- উৎস থেকে ষাটি দহ। মধ্যগতি- ষাটিদহ থেকে রোহিনী। নিম্নগতি- রোহিনী থেকে মোহনা পর্যন্ত।

সুবর্ণরেখা নদীর নামকরণের ইতিহাস খুব বিচিত্র।

ক) 'সুবর্ণরেখা' ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'সু-বর্ণ-রেখা'। 'সু' এর অর্থ 'সোনা', 'বর্ণ' এর অর্থ 'রঙ', 'রেখা' এর অর্থ 'দাগ'। অর্থাৎ 'সোনার রঙের দাগ'।

খ) নদীর উৎসমুখে রাঁচির পিস্কা অঞ্চলে সোনা খনন করা হয়েছিল, তা থেকে নদীর নাম 'সুবর্ণরেখা'।

গ) ছোটনাগপুর মালভূমির খনিজ অঞ্চল থেকে প্রবাহিত হওয়ায় এক সময় জলে সোনার গুঁড়ো পাওয়া যায়। তা থেকে নাম হয় 'সুবর্ণরেখা'।

ঘ) 'সোনাহাতু' গ্রামের নাম থেকে 'সুবর্ণরেখা'।

ঙ) সুবর্ণরেখা নামের উৎস্য সম্পর্কে নদীপাড়ে মানুষজনের একটি মিথ রয়েছে—ঝাড়েশ্বর পানী বলে—**"বেহারা বুড়ার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা তার ঠাকুর্দার তার ঠাকুর্দা পুত্র কামনায় নদীজলে সোনার থালা ভাসাই থিলা বলি না নদীর নাম হলে 'সুবর্ণরেখা'।"৫**

এটি ভারতের পূর্ব বাহিনী নদী। কিন্তু জঙ্গলমহলের আদিবাসী মানুষজনের কাছে সুবর্ণরেখা গঙ্গা নদী—গঙ্গার মতো পবিত্র জল। ঝাড়েশ্বর পানী নদী জলে তর্পন করে ললিনকে বলে -

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

"ওঁ গঙ্গা ওঁ গঙ্গা। আসলে কী জানল ললিন সবু নদী গঙ্গা, সবু নদীরজল গঙ্গাজল।"৬

এই নদীর তীরে অজ্ঞাত বাসের সময় চৈত্র সংক্রান্তিতে মহাভারতের যুধিষ্ঠির বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ করেন ছাতু দিয়ে। আজও নদীর বালিয়াড়িতে চৈত্র সংক্রান্তিতে 'বালিজাত' উৎসব পালিত হয়। এছাড়া আছে 'পাণ্ডরা' গ্রাম, এটি পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসস্থান। 'অসুরহুড়া'—যেখানে ভীম গদার দ্বারা অসুরের হাড় গুড়া করেছিল। 'ভাতহান্ডি'—যেখানে রান্না করা ভাতের হাঁড়ি রাখতেন দ্রৌপদী 'পাণ্ডবেশ্বর'—পাণ্ডবেরা শিবের আরাধনা করতেন।

নদীতে মাছ ধরে, নৌকাচালিয়ে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। একটা সময় এই নদীতে জাহাজ ডোবা জল, বড় বড় ঢেউ, জোয়ার-ভাটা, ইলিশ মাছ ছিল। সমুদ্র খুব কাছেই ছিল। তখন ইলিশ মাছ সাঙাল জালে ধরা পড়ত। এখন নদীতে বাটা-খয়রা, রুই-কাতলা, চাঁদা মাছ। হংসী বধুক ললিনকে শুধায়—

"অখন ত বাটা-খয়রা, আঘু তভু কুদি মারি ইলশা উঠথায় অউ সুবর্ণরেখায়।"৭

নদীজালে সারা বছর 'গাতিজাল', 'মাথা-ফাবড়ি' জাল ফিকে মাছ ধরে খান্দার পাড়ার মাধ্ব পানী, ঝাড়েশ্বর পানীরা মনের আনন্দে। কিন্তু 'মশালির দহ', 'মহিষাসুর দহ' থেকে যায় মহাজনের জীম্বায়। টিকিট কেটে মাছ ধরতে হয়। মাঝে মাঝে 'বড়োডাঙা'র দহ নিয়ে থুরিয়ার মহাজনদের সঙ্গে বিবাদ হয় নদীর এপাড়ে বড়োডাঙা, নোয়াসাই, বাছুর খোয়াড়, দেউলবাড় গ্রামের মানুষজনের সঙ্গে। নদীর ওপর ঘাট নির্মাণ করে—উপর কুলহির সাঁওতালরা। তারা স্নান করে। মেয়েরা নদী ঘাটে আসন কাঠের ছাই দিয়ে সেদ্ধ কাপড় কাচে।

আদিবাসীদের কাছে নদী জীবনের পথ চলা সহজ সরল করলেও বর্ষণ মুখর নদী আপন বেগে নদীর দুকূল ছাপিয়ে যায়। নদী তখন 'কাতা ভাঙে', 'উড়াল ঘূর্ণী' দেখা দেয়। তখন মানুষ জীবনের তাল কেটে ঘরবাড়ি ছেড়ে, গবাদি পশু-পাখি নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে উঁচু স্থানে, স্কুল বাড়িতে ওঠে। গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে একে বারে পৃথিবীর বাইরে এসে পড়ত।

বর্ষাকালে নুড়িপাথর-বালি ও নদীধার ভেঙে গড়ে ওঠে 'খুদুপাল' 'বৈশাখী পাল'। চরকে 'পাল' বলে। 'বিষ্ণু পুরাণ'-এ বরাহ রূপী বিষ্ণুর চর সৃষ্টির কাহিনীতে জঙ্গলমহলের মানুষেরা বিশ্বাস করে নেয়। ভগবান দাঁতে করে এই চর তুলে ধরে। একশো পঁচিশ বিঘা চরে নদীর দুপাড়ের মানুষজন পশুচারণ, রাখাল বালকেরা খেলাধুলা করত। শীতে কারিকুরি পাখিরা আসত, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের 'হাটুয়া নাচ', মহড়ানাচ, ফারিখেলের নাচ নাচত। কেঁওট কৈবর্ত্তরা জমির অধিকারে খুঁটিপুতল, মাছধরল, দুপাড়ের জমিহারারা জমির অধিকারে এল। কিন্তু রোহিনী গড়ের জমিদাররা বৈশাখী পাল অধিকার করে। এক সময় সবজমি দুই পুরুষধরে - চৌধুরী লক্ষ্মীনারায়ন ষড়ংগী ও বিবাহিত কন্যা শৈলবালা দুই ক্রেতাকে বিক্র করে। ফলে 'বৈশাখী পাল' নিয়ে প্রথম যুদ্ধ গরীব সাঁওতালদের সঙ্গে জমিদারদের। সাঁওতালরা ভয়ে লুকিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় যুদ্ধ—দুই ক্রেতা বীরকালীদহ, উমেশচন্দ্রদের সঙ্গে বহড়াদাঁড়ির গয়া দত্ত সহ একুশজনের সঙ্গে। এই যুদ্ধ শুরু হয় সপ্তমী তিথিতে - শনিবার। উভয় দলের লোক মারা যায়। মামলা গড়ায় ঝাড়গ্রাম আদালতে। শেষ পর্যন্ত গ্রাম্য শালিশে উভয়দল অর্ধেক অর্ধেক অধিকার পায়। বৈশাখী পাল নিয়ে সন্তোষ দাস গান বাঁধে—

"বিধি যাহা লেখি আছে কপালে।
বৈশাখী পালে গো বৈশাখী পালে—।"৮

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ললিন রোহিনী চৌধুরী রুক্মীনীদেবী হাইস্কুলে ইতিহাসের শিক্ষক ও সহপাঠীর কাছে জানতে পারে রোহিনী গড়ের ইতিহাস। রোহিনী গড় আসলে শ্রীমতা শৈলবালার গড়। এই গড় দুশো বছর আগে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে তথা ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিত দুর্গ বানায়, এবং তাকে হত্যা করে বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁ। বর্গিরা ছত্রিশগড় থেকে ওড়িশা হয়ে মহানদী পেরিয়ে সুবর্ণরেখার নীল স্বচ্ছ জল ঘোলা করে বনবাদাড়, মাঠ পেরিয়ে রোহিনী-কুলটিকরী, কেশিয়াড়ী, দাঁতন, বেলদা, নারায়ণ গড় লুট, অত্যাচার করতে করতে মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের ধনভান্ডার লুঠ করে। তবে কিঁয়ারচাঁদের আদিবাসী সামন্তরাজা জহর সিং পরিবার ও আদিবাসী প্রজাদের বর্গীর হাত থেকে রক্ষা করে। পাথরডাঙ্গার সাঁওতাল – হো - ভূমিজ - বীরহড় আদিবাসীদের মৃত পূর্বপুরুষদের বীরত্ব গাঁথার প্রতীক স্তম্ভ 'মাকড়া পাথর'। তা তুলে নিয়ে প্রান্তরে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় জহর সিংহের নির্দেশে প্রত্যেক পাথরের মাথায় মশাল জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। অন্ধকারে সারিবদ্ধ কালো স্তূপের ওপর মশাল দেখে বর্গীরা পিছু হঠে। জহর সিংহের পরবর্তী রাজা কালুভুঞ্যা নিজে ও কন্যা রাউৎমনি নয়াগ্রামের তস্কর রাজা দিব্য সিংহের হাতে হত্যা হয়। রানী 'কুসুম' দিঘিতে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে, পরে ঐ দিঘির নাম হয় 'কুসুমীখাল'।

ললিন ছোটো পিসিকে খুঁজতে খড়গপুরে যাওয়ার পথে সালুয়া মিলিটারি ক্যাম্প দ্যাখে, যা ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গল মহলের মধ্যে অবস্থিত মানুষের সুরক্ষাকেন্দ্র। এইখানেই মিলিটারি কাজ করে ললিনের পাশের গ্রাম— **"ভালিয়া ঘাটির মঙ্গল সরেন, টটাসাহির ত্রিলোচন হাঁসদা, ডাঙাসাহির বুধন মুর্মু।"৯**

ললিন ছোটকার সঙ্গে প্রথম খড়গপুর স্টেশন ও ট্রেন দেখে অবাক হয়। আদিবাসীরা শালগাছ কেটে প্রথম বসতি স্থাপন করে। তখন গ্রামের নাম ছিল 'দমদমা'। ধারেন্দার রাজা 'খড়গসিংহ' বা 'খড়গেশ্বর' মন্দিরের নাম অনুসারে 'খড়গপুর'। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে চৈতন্য দেব জঙ্গল মহলের ওপর দিয়ে যাওয়ার ফলে হিন্দুরা আদিবাসীদের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করায়, ইংরেজ আমলে জঙ্গলমহলে স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ গোঁসাইরা আদিবাসী সামন্ত রাজাদের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বানাতে লাগল। এই ট্র্যাডিশন এখনও চলে আসছে। ললিন ও তার সহপাঠীরা সাঁওতাল-মাহাতো-মুণ্ডা সম্প্রদায়ের হওয়া সত্ত্বেও হস্টেলের রাধুঁনি ব্রাহ্মন টুনিঠাকুর 'গমহা' (রাখীপূর্ণিমা)র দিন পাঁচ টাকার বিনিময়ে পৈতে গলায় ঝুলিয়ে উচ্চ বংশতালিকা রুচে দিত। উচ্চ হিন্দু টুনি ঠাকুর হস্টেলের চাল চুরি করে ললিনের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে খাদ্যের জন্য জীবন সংগ্রাম থাকলেও চৌর্যবৃত্তি নেই। তারা সাধ্য মত উপাদেয় খাদ্যে জীবন অতিবাহিত করে, কখনো নেশা করে। নারী-পুরুষ উভয় মহুলে মাতাল হয় হাতিবান্ধির ডোমপাড়ার রাখালমুখী ও স্ত্রী কালিন্দী 'প্রোটো-অস্ট্রালয়েড', জাতিতে হাড়ি, কালো গায়ের রঙ, সরল বোকা, হতদরিদ্র, লেখাপড়াহীন হওয়ায় দুমুঠো ভাতের জন্য রোহিনী স্কুলের হস্টেলে দেড়শো দুশো জনের বাসন মাজতে আসে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে।

সুবর্ণরেখা নদী তীরে গ্রামগুলো প্রকৃতির কোলে সাজানো গোছানো। বুড়বুড়ির ঝর্না, দহ, হুড়ি, ছোটোখাটো পাহাড়, জলাজমি, নদীবালি, নদীজল, কোদোপাল, বৈশাখীপাল, বেঁচি-কাঁটকুল-আকন্দ-শাল-পলাশ-শিমুল-চম্পা প্রভৃতি গাছ-ঝোপঝাড়, ছটমাটি-গিরিমাটি লেপা, কাঠকয়লা হলুদ দিয়ে লেপা দেওয়াল বাড়ি বিচিত্র রঙে রাঙানো। খড়ের ছাউনী ছোটো ছোটো বাড়ি। বাড়ির উঠোন লাউ-সিম-লতির মাচা, ফুল-পাতায় পরিপূর্ণ, কুলহী রাস্তা। বাড়িগুলো ঝকঝকে তকতকে। সকড়ি মান্য করে। মাটির পাত্রে ও শালপাত্রে জল ও খাবার খায়। খেজুর পাতার চাটাইতে ঘুমায়। নদীর পাড়ে উর্বর পলিমাটিতে নানাধরনের সবজি চাষ করে। কাকুড়, কুদরি, ভেলা-ভড়রু, কষাফল, পান আলু, খাম আলু, চুন, চুরকা, মেহা-মাদাল প্রভৃতি ফলমূল উৎপন্ন হয়। চৈতালী বেগুন, বৈতাল নদীতে মাছ ধরে, দলজমিতে – ধানাহুলি, কই, মাগুর ধরে শাকপাতা কুড়িয়ে আনে। এখানকার আদিবাসীদের

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বিশেষখাদ্য হল - বাদুড়, চামচিকা-ব্যাঙ-ইঁদুর, বাঁশরোলসেদ্ধ, শালুই পোকাভাজা,তেতুলবিচি দিয়ে মহুল সেদ্ধ, লেটো, চল্লা ফলের শাঁস, লাউয়ের চুপি, বিবাহ অনুষ্ঠানে খাসি, শুকরের মাংস - রক্তভাজা খায়। মহূলের হাড়িয়া খায়।

মানুষজনেরা জীবিকা রূপে মাছ ধরা, নৌকাতৈরি, জলবোনা. শাল কাঠের ডোঙা বানায়। মাটির হাঁড়ি কলসী নির্মান করে কুম্ভকারেরা। সাঁওতালরা বাঁশের বিভিন্ন জিনিসপত্র – কুলা, ধামা, চালা, দড়ির খাটিয়া নির্মাণ করে। নদীর চরে বাগালরা- গরু, মেষ, ভেড়া, ছাগল, শূকর প্রতিপালন করে। রিলিফের কাজ করে, নয়তো দূরদেশে কাজে যায়।

"বাড়ির কর্মক্ষম লোকেরা হয় আশেপাশের খেত খামারের নয় 'নামাল' বা 'পুবাল' ঘাটতে পূবদেশে।...কার্যোপলক্ষে মানুষ ঘর ছাড়া, কেউ গেছে বনে, কেউ গেছে রণে,"১০

উর্বর জমিতে ধান চাষ করে - জলকলস, কলসকাঠি।

সাঁওতাল, ভূমিজ-মাহাতো জনজাতিরা বাড়ির কাছে কাকডাকা অশুভ মনে করে। ললিনের বাড়ির সামনে কাক ডাকায় তার বুড়ি ঠাকুমা মারা যায়। তারা মৃত্যু সংবাদ সরাসরি দেয় না। ললিন 'দুর্মুখ' হয়ে কুসুমতলায় চাষরত কাকু - কাকিমাদের বলে— **"তোমাদের মায়ের খুব বাড়াবাড়ি, এখন তখন অবস্থা, ঘরকে চল।"১১**

মানুষজন শুভ কাজে বেরহন, বার তিথি মেনে। এমন প্রবাদ আছে— 'মঙ্গলে উষা বুধে পা যথা ইচ্ছা তথা যা'। হাটুয়া মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলে না। কারো মুখের সঙ্গে অন্যের মুখের মিল থাকলে 'স্যাঙ্গাৎ' (পুরুষদের ক্ষেত্রে), 'স্যাঙাতিন' (মেয়েদের ক্ষেত্রে) পাতায়। বৃষ্টিপাতের স্থায়িত্ব সম্পর্কে খনার বচন বিশ্বাস করে— 'শনির সাত মঙ্গলের তিন আর সব দিন দিন।' কালপেঁচা চালের টুইয়ে বসলে 'পুষ্করা' দোষ ঘটে। তা কাটানোর জন্য গুনিন ভাস দেয়— 'গৃহস্বামীর সমূহ বিপদ ঘটবে; প্রথম বিপদ ঘটবে পশু-পাখিদের, তার পর মানুষের। এর প্রতিকার - একশো আটটা পদ্ম, সাড়ে ন-সের ঘি দ্বারা স্বস্তয়্যন ও যাগযজ্ঞ করা। ললিনের বাড়িতে পুষ্করা দোষ লাগায় হালের মোষ অজানা রোগে হঠাৎ মারা যায়। গ্রামের পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন ভয়পায়। তাদের বাড়িতে আসা বন্ধ করে। 'দু'মাস পরে ন-কাকার ছেলে 'গাঙান' অজানা জ্বরে মারা যায়। গোরু-মানুষের চিকিৎসা হয় গুনিন, কবরেজ, হোমিও প্যাথ, ঝাড়ফুঁক, টোটকা, ছাড়ান, নিমছাল প্রভৃতির মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত ললিনের বাড়িতে পুষ্করা যজ্ঞ হয়। পুষ্করা বাড়ি ছাড়ার সময় 'ত্রিপদ' পায়ের ছাপ পড়বে দোরগোড়ায় পাতাবালিতে। গ্রামবাসীরা দ্যাখে— **"তিন তিনটে পায়ের ছাপ! চিহ্নিত, মুদ্রিত, ভয়খচিত ত্রিপদ! ভরসা যা এই— তিনটে পা-ই স্পষ্ট চিহ্নিত বর্হিগমন!"১২**

আদিবাসীরা গুনিন, ভূতে বিশ্বাসী। গুনিনরা ভূতকে দিয়ে বাড়ির কাজ করায়। গুনিন বিভূতী, বলকা সাঁওতাল ভূতকে পোষমানায়, বউ বানিয়ে কাজ করায়। আদিবাসীদের বিশ্বাস তাদের হাতের সিঁদুর রক্তে মাটির হাতি ঘোড়া জীবন্ত দেবতা-দানো হয়। ভূমিজদের 'গরামথান', সাঁওতালদের 'জাহের থান' এ ভূতদের আস্তানা। মানুষ, পশু-পাখি হারালে গুনিনের স্মরণাপন্ন হয়। গুনিন বলকা শালপাতায় মন্ত্রপুত তেল দেখিয়ে সুলুক আওড়ে পথনির্দেশ করে;—

"ডানে দুয়ার সিনি বাঁয়ে যুগনী।

যাবি তো যা দক্ষিণ মুখো সামনাসামনি।"১৩

ছোটোপিসি সুভদ্রা তথা খেপীকে খুঁজতে ললিন ও তার ছোটো কাকা বালকার নির্দেশে সুবর্ণরেখার পশ্চিমে - উৎসে এগোয়।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

আদিবাসী সমাজে 'ডাইনী' কুপ্রথা প্রচলিত। হংসী নাউড়িয়ার বোনকে লব কিশোর পুরের শ্বশুরালয় থেকে তাড়িয়ে দেয় 'ডাইনী' সন্দেহে —

"দেবতা-পিশাচ-ডাইনীদের চোখে নাকি জল থাকেনা।"১৪

অশিক্ষিত মানুষেরা বিশ্বাস করে 'সত্যযুগে' ধানগাছে ফলত চাল, তা তুলে সেদ্ধ করে ভাত। বনঝাড়ের কার্পাস গাছ থেকে নানা রঙের কাপড় জন্মাত। মাথা খুলে উকুন বাছত। মেঘপাতাল হাতের কাছে ছিল; সাঁওতালদের ঘরবাড়ি দুঃখ-দুর্দশা দেখে। কিন্তু সাঁওতাল মেয়েরা শালপাতায় ভাত খেয়ে এঁটো না ধুয়ে রাত্রিতে রেখে দেয়। এঁটো পাতা বাতাসে উড়ে মেঘপাতালে লাগায় 'গরাম দেবতা' 'ধুর বোকা সন্তান' বলে মেঘপাতাল সরিয়ে দেয়। তাই সাঁওতালরা এঁটো খুব মানে। সাঁওতালরা মানব আত্মায় বিশ্বাসী, জাতপাতে নয়। 'চান্দোবোঙা' মানুষের শরীর নির্মাণে কখনো কখনো কুকুর-বিড়াল-শিয়াল-শূকর-ব্যাঙ-বাঘ এর আত্মা দানের জন্য মানুষের স্বভাব ঝগরুটে, বদমেজাজী হয়। মানুষের আত্মা পেলে স্বভাব-চরিত্রে মানুষ হয়। শকুনের পালক শুভ বা কল্যাণের প্রতীক। শিশুদের জন্মানোর সময় বার-তিথি মেনে নামকরণ করার রীতি রয়েছে। গয়া প্রসাদ কথা বলতে না পারায় নামকরণ হয় 'গঁ গা'। সবুজ ব্যাঙ মরে না। তাদের বিশ্বাস সবুজ ব্যাঙ মারলে বাজপড়ে, বিদ্যুৎ চমকায়, ঝড়বৃষ্টি হয়। জটিয়া বলে –

"অকালে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি হলেই জানবি কেউ না কেউ কোথাও সিমপাতা রংয়ের ব্যাঙ মেরেছে।"১৫

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে জঙ্গল মহলের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় একত্রে বসবাস করায়, তারা একত্রে 'বাহা', 'করম', 'টুসু', 'মাঘসিম' পরব পালন করে। চাষ শুরুর আগে 'রহিন উৎসব' (হলকর্ষণ উৎসব) হয়। নবজাতকের পঞ্চম দিনে নখ, চুল কেটে স্নানের মাধ্যমে অশৌচ কাটে। এই সময় শিশুর নামকরণ হয়। আদিবাসীরা সূর্যদেবতার উপাসক। নদীজলে স্নান করে সূর্যদেবতার পূজা করে। কুমারী মেয়েরা পঞ্চমী তিথিতে পুকুরে দলবদ্ধভাবে স্নান সেরে 'করম' উৎসব পালন করে। বাঁশের ঝুড়িতে মাটি দিয়ে ছোলা, মটর, কলাই পুঁতে রাখে। উৎসবে পিঠেপুলির পায়েস হয়। সন্ধ্যায় গ্রামের ছেলেরা জঙ্গল থেকে 'করম' গাছের ডাল কেটে আনে কুড়ুলের এক কোপে। ডালটিকে গান গাইতে গাইতে বেদীমূলে স্থাপন ও সারা রাত নাচ গান হয়। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে টুসু পরব হয়। 'গরাম থান', 'জাহের থান'-এ তারা হাতি ঘোড়ায় সিঁদুর লাগায়, বলির রক্ত লাগায়। টুসু পরবে নতুন পোশাক পরে। শীতলা পুজা করে। হিন্দু সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে 'দুর্গোৎসব' পালন করে।

আদিবাসী পরিবার যৌথ পরিবার। পরিবারে গৃহকর্তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। ললিনের বড়দা শ্রীকান্তের পাত্রী দ্যাখে মেজোকাকা, এক গাঁয়ে পতিত পাবনের কন্যা, দু'ক্লাস পড়া, ছাগল চরানী সরলার সঙ্গে। নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত। এদের বিবাহ বেশ চমকপ্রদ। গৃহকর্তার নির্দেশে বিবাহের প্রস্তাব আসে বরপক্ষ থেকে। কন্যাপণ প্রচলিত আছে। বর-কনে পছন্দ, আশীর্বাদী প্রথা প্রচলিত। বিবাহের দিনক্ষন নির্দিষ্ট করে নানা আয়োজন করা হয়। বিবাহের পণের সঙ্গে একটি করে কনে শাড়ি, শালা ধুতি, শালি শাড়ি, মামা ধুতি, বামুন বিদায় শাড়ি, নাপিত বিদায় শাড়ি, জোড়ের ধুতি, বাঁধা পানির ধুতি - শাড়ি দেয়। এই শাড়ি ধুতি গুলোতে হলুদ গাবানো হয়। কুমারী মেয়েরা হলুদ গাবায়। কুমারী মেয়েরা নিজেদের কামনা বাসনা প্রকাশকরে। মেয়েলী গানের মধ্য দিয়ে। -

'বেহা বেহা করি আমাদের কবে হবে বেহা গো

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

কইন্যার মামা ঘরে না পাইল গুয়া পান গো।'১৬

সবাই একসঙ্গে গেয়ে ওঠে-

'তাকে যে লো দেখেছিলি ছাগলবাগালী,

ছাগল টাগল খেদাঁয় দিয়ে কইন্যা হয়ে আইলি।'১৭

আদিরসাত্মক, ব্যঙ্গাত্মক গানে ললিনদের বাড়ি হলুদ বিয়ে বাড়িতে পরিণত হয়।

বাহা বাড়িতে সৃষ্টিধর আগুয়ান, ধনঞ্জয় বাগ, মাথো ডোম, ভটা ডোমদের তোওড়া,দাদরা, ঢোল চ্যাচ্চেড়ি, টিন- কাঁসি, সানাই বাদ্যযোগে ডাক পড়ে। ঢোল বাজিয়ে বিয়ের শুভারম্ভ হয়। অনেক সময় কলের গানও বাজতে থাকে। 'ছামড়া গাড়া' র জন্য জঙ্গল থেকে শালরলা শালবল্লা কেটে আনে জামাইবাবুরা, ভগ্নিপতিরা। এটাই রীতি নীতি। চার কোণে চারটি শালখুঁটি পুঁতে মাথায় চারটি শালরল্লা বেঁধে শালপাতার ছাউনি করা হয়। শালিরা বালতি বালতি হলুদ গোলা জলের ফোয়ারা ছোটায় ভগ্নিপতিদের ওপর। মুহূর্তে বিয়ে বাড়ি হয়ে ওঠে 'হলুদ বাড়ি'। বর গোধূলি লগ্নে হলুদ গাবানো নতুন ধুতি, সাদা স্যাণ্ডো গেঞ্জি, মাথায় টোপর দিয়ে দুয়ারে দাঁড়ায়। মা 'স্ত্রী আচার' পালন করে। গরুর গড়ি চড়ে, হ্যাজাক লাইট নিয়ে বিয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ছাদনা তলায় 'বাঁধা পানি'তে বসিয়ে বর-কনেকে চুমা খেয়ে কনেকে যৌতুক দেয়। বহাবাড়িতে 'কহবর' থাকে, যেখানে বিয়ের পর বাসররাত জাগা হয়। আতপ চালের গুড়ো, হলুদগাবা, আলতা সহযোগে দেওয়ালে আঁকা হয়। **"পলকি সামনে পিছনে দুজন করে বেহারা থাকে, কাজললতা, সিঁদুর-কৌটা, পানপাতা, জাঁতি, বরকনের টোপর, গহনার বাক্স, শোলার কদম ফুল, কড়ি লাগানো বেতের চুবড়ি, চারিদিকে মধুবনি আটের মতো চৌখুপী।"১৮**

সাঁওতালরা মাদলের তালে মজে যায়। উভয় পক্ষের বাজনায় কন্টেস্ট হয়। মেডেল দেওয়া হয়। তখন এমন অবস্থা হয়—

'ঢোল বাদন আর চ্যাচ্চেড়ি বাদনই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় বিয়ে টাই গৌন।'১৯

বাদ্যকারেরা সম্মিলিত কনসাট ধরে— **'সারারাতি ফুল কুড়ালি পৈসা পেলি কই!'২০**

বরকর্তা কনেপক্ষকে হলুদ মাখা গোটা সুপারি দিয়ে বৌভাতে আমন্ত্রণ জানায়। 'কন্যাবিদায়' পর্বে 'কাঁদলাগীত' প্রচলিত। সরলা বাপ-মাকে ধরে কাঁদনা গীতি গায়।

ক) বাপকে ধরে কাঁদনাগীতি—

'শুকসারি ঝুলে কদম্ব ডালে এ বাপ।

মুহি ঝুলি থিলে তুমর কোলে এ বাপা॥

শুক সারি গলে বৃন্দাবন চলি এ বাপা।

মুহি এবে যাবা শ্বশুরালী এ বাপা॥'২১

খ) মাকে ধরে কাঁদনাগীতি—

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

'দশমাস দশ দিন গর্ভর মাগো।

ধরিণ থিল ত কেতে কষ্টর মাগো॥

নিজে ন খাই ত ঘুআইথিল মাগো।

ষোল বর্ষ যাএ পাশে রখিল মাগো॥

.....

পঠাই দেউছ দূরদেশর মাগো॥

.....

বিহি ঘটনা যে হোইছি এহা মাগো।

ভাঙ্গা গাড়িরে কি ছিঁড়া পটিয়া মাগো।

এ গাড়িরে মুহি উঠিবি নাহি মাগো।

সুয়রী আসিলা বেহারা কাঁহি মাগো॥'২২

মায়ের কাছে কন্যা সুখ-দুঃখ নিবেদন করে পালকীতে যাওয়ার বাসনা করলেও পালকি নেই। এতে বরযাত্রীদের আঁতে ঘা লাগে। তারাও কন্যার মাকে শোনায় ছড়াকেটে—

'থাকলো কইন্যার মা

ঠেপা চপা দিয়ে,

তর বিটিকে লয়ে যাছি।

ঢাকঢোল বাজায়ে।'২৩

বর-কনে বাড়িতে আসলে সিংহদ্বারে 'খিল খুনানি' স্ত্রী আচার পালন হয়। এরপরে ছামড়াতলায় 'গুড় খাওয়ানি' পর্বে কণে গুড় থু করে ফেলে দিলে, কন্যার মান হয়েছে বলা হয়। কন্যার মানভাঙাতে উপহার দেওয়া হয়— এক ছড়া রুপার হার। ছাঁতনাতলায় বর-কনের চুমানো ও আশীর্বাদী অনুষ্ঠান 'বাঁধ-পনী'তে নানা উপহার দেয়, ছড়া কাটে, গান করে। পরের পর্ব 'কাঁকড়া ধরা'। এটি কনে ও বরের বাড়িতে হয়। বরের বাড়ির বালক বালিকারা নতুন কাঁসার থালায় কনের পা ধোয়ায় ঘটির জল দিয়ে এবং কনের বুড়ো আঙ্গুল হাত দিয়ে চাপ দিয়ে পাওনা আদায় করে।

নদী, মাঠ, অরণ্য জঙ্গলমহলের মানুষজন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াকর্ম করে নদীকে কেন্দ্র করে। বাহা ঘরে 'কাদো-ঘাটি' ও 'ঘটি লুকানো' পর্ব অনুষ্ঠিত হয় সুবর্ণরেখানদীতে। কারন, **"যেকোনও উৎসব-অনুষ্ঠান পালা-পার্বণের সূচনা হয় নদী বা অরণ্যে, সমাপ্তিও ঘটে নদী বা অরণ্যে। কী বেহা ঘর, কী করম, কী মকর নদী মাটি অরণ্য যেন আমাদের আত্মার আত্মীয়, ঘরের লোক। তাদের বাদ দিয়ে ঘরের কোনও কাজ হওয়ার নয়। জঙ্গল থেকে শাল-রলা শাল-ডাল কেটে এনে 'ছামড়া গাড়ার' মধ্য**

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

দিয়ে যে 'বেহাঘর'এর সূচনা হয়েছিল, নদীতে সেই 'ছামড়া'রা ডালপালা বিসর্জন ও 'কাদো-ঘাটি' অনুষ্ঠান উদযাপনে সেই 'বেহাঘর'এর সমাপ্তি ঘটল।"২৪

সুবর্ণরেখা সুবর্ণময় মানুষগুলোর উৎসব অনুষ্ঠানে, জীবনের ইতিহাসে দোসর হয়ে উঠল—

"অভ্রনন্দিত সুবর্ণরেখার সুবর্ণরেণু মেখে ছাগল - চরানী সরলার ফর্সা গাল - কপাল রৌদ্রে চিক্ চিক্ করে উঠল। দেওর-বউদির এহেন কাদা তথা বালি মাখামাখি নিয়ে জোর একপ্রস্ত হাসি-হুল্লোড় ঠাট্টা - ঠিসারা হল। নদী দেখল, সব শুনল, হয়তো রঙ্গ দেখে মনে মনে হাসল, তবু রা কাড়ল না - সংবৎসর কী গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত ও বসন্তে এরকম 'কাদো-ঘাটি' সে কত দেখেছে!"২৫

আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে 'দিশম' (শিকার) নারী বর্জিত। সুবর্ণরেখার তীরবর্তী সাঁওতালরা বেহাঘরে 'দিশম সেঁদরা' (শিকার উৎসব) এ মেয়েদের যুক্ত করে। এটি প্রতীকী অনুষ্ঠান। বরের তীরবিদ্ধ পাতা নব বধু কুড়িয়ে আনে। কারণ, বনে পশুর অভাব। তীরের দিক নির্ণয় নব বর-কনের জীবনের মঙ্গল সূচনা বলে মনে করা হয়।

"বিবাহ অনুষ্ঠানে নাপিত, বামুন আসত তাদের চতুরতাকে ব্যঙ্গ করে ছড়া কাটত। ব্রাহ্মণ সম্পর্কে ছড়াকেটে বলত—

'আইলা বাভন মাইলা তালি।

নিই পলাইলা চাউল থালি।'২৬

'বেহাঘরে' মেয়েরা—লাল-নীল-টিয়ারঙ, মাছরাঙারঙ, সাদা-হলুদ গাবা বিচিত্র রঙের খুরদা শাড়ি পরত। গ্রাম ফাণ্ডে উভয় পরিবারকে জরিমানা স্বরূপ নগদ টাকা, এক হাঁড়ি মিষ্টি দিতে হয়। প্রীতি ভোজে খাসি, ঘুসুর, মুড়ি মুড়কি দেওয়া হয়।

আদিবাসীরা প্রকৃতির কোলে আপন সংস্কৃতিকে লালন পালন এর দ্বারা নিজেদের জীবনকে সুখে – স্বাচ্ছন্দে অতিবাহিত করে। মাঝে মাঝে হাতির হানায় জনদজীবন, ক্ষেত-খামার-বাড়ি বিপর্যস্ত হয়।

উপসংহার:

শাবলটান লেখক নলিনীবেরার 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা' উপন্যাসের মধ্যে জঙ্গলমহলের সুবর্ণরেখা নদী বিধৌত বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের জীবনসংগ্রাম, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, লোকবিশ্বাস-সংস্কার মেনে প্রকৃতির কোলে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে চলেছে। তাদের জীবনের ইতিহাস তালকাটে না। তারা নদীপ্রবাহের মতো কালপ্রবাহে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত পরিবর্তন করছে। আপন সংস্কৃতিকে লালন পালন করে চলেছে। লেখক নলিনী বেরা সাধারণ অনাড়ম্বর সহজসরল অনার্য মানুষদের সুখ-দুঃখের কাহিনী পরিবেশন করে চলেছেন সাঁওতাল মেজদিদির রূপকে। ললিনের মেজদিদির ন্যাকড়া জোড়া নতুন চটিজুতো আবিষ্কারের মতো, লেখক অনার্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতা উল্টে চলেছেন। প্রতিটি পাতায় ফুটে উঠেছে স্থানে স্থানে অনার্যদের বসবাসের ইতিহাস। কারণ, **"প্রত্নমানবরাই জঙ্গল কেটে খুঁটকাটি পুঁতে জলশূণ্য জঙ্গলভূমি আবাদ করে সর্বপ্রথম এতদ্-অঞ্চলকে বাসযোগ্য করে তোলে।"২৭**

Endnote:

All rights reserved. © 2026

1. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, 'জঙ্গলমহলের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০১২, পৃষ্ঠা-৩৮
2. বেরা, নলিনী, 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, নবম সংস্করণ, 'আনন্দ পুরস্কার ১৪২৫' প্রাপকের অভিভাষণ, জানুয়ারি ২০২৩
3. বেরা, নলিনী, 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, নবম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২৩, পৃষ্ঠা-২৪
4. তদেব পৃষ্ঠা - ২৮
5. তদেব পৃষ্ঠা- ২৯
6. তদেব পৃষ্ঠা- ৪১
7. তদেব পৃষ্ঠা- ৪২
8. তদেব পৃষ্ঠা- ১৬১
9. তদেব পৃষ্ঠা- ২২৪
10. তদেব পৃষ্ঠা- ১৯৬
11. তদেব পৃষ্ঠা- ১৩৭
12. তদেব পৃষ্ঠা- ৭৯
13. তদেব পৃষ্ঠা- ১৯৩
14. তদেব পৃষ্ঠা- ১৫৩
15. তদেব পৃষ্ঠা- ১৮৮
16. তদেব পৃষ্ঠা- ২৫৩
17. তদেব পৃষ্ঠা- ২৬৭
18. তদেব পৃষ্ঠা - ২৬৭
19. তদেব পৃষ্ঠা- ২৬১
20. তদেব পৃষ্ঠা- ২৬৮
21. তদেব পৃষ্ঠা- ২৬৮
22. তদেব পৃষ্ঠা- ২৬৮-২৬৯
23. তদেব পৃষ্ঠা- ২৬৯
24. তদেব পৃষ্ঠা- ২৭৪-২৭৫
25. তদেব পৃষ্ঠা- ২৭৬
26. তদেব পৃষ্ঠা- ২৬৩
27. তদেব পৃষ্ঠা-২৬৫-২৬৬

Bibliography:

1. বেরা, নলিনী, 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, নবম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২৩।

All rights reserved. © 2026

2. সরকার, সুনীতি, 'নলিনী বেরার উপন্যাসে প্রান্তবাসীর বিশ্বায়ন', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, ২০২৫।
3. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র, 'জঙ্গল মহলের জনজীবন ও লোক সংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০১২।
4. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ', 'সুবর্ণরেখা', প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ২০১১।
5. বোরকেটা, হেমলতা, 'বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবন', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ২০২০।
6. মন্ডল, দীনবন্ধু, 'সত্তর উত্তর বাংলা উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবন', আশাদীপ, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫।
7. চক্রবর্তী, সুধীর, 'সাহিত্যের লোকায়ত পাঠ', পত্রলেখা, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, ২০১৩।
8. Subarnarekha, water Resources Information System of India.
9. বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার, 'বাংলার নদনদী', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩।
10. চক্রবর্তী, শান্তনু, 'পুস্তক সমালোচনা' 'সুবর্ণরেণু সুবর্ণরেখা',পরবাস জার্নাল, সংখ্যা – ৭৬, সেপ্টেম্বর ২০১৯।

All rights reserved. © 2026